International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.01-10

কালকূটের 'শাম্ব' উপন্যাসে পুরাণ অনুষঙ্গ ও তার পুনর্নির্মাণ

মানিক মৈত্র
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও S.A.C.T-I বাংলা বিভাগ, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় (শিলিগুড়ি), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

*Samresh Basu has written a number of travel-novels based on Indian mythology under the pseudonym **Kalkut**. Notable compositions in it are - 'Amrita Kumbher Sandhane', 'Shambha', 'Khunje Phiri Sei Manush', 'Sri Chaitanya'. The novel we are discussing is **Shambha**. The novel was first published in the 1978 issue of Desh Patrika Shardiya. The novel won the Sahitya Akademi Award in 1980, two years later. How much Kalkut has adopted and reconstructed the Puranas in the novel, and how he has even expressed contemporary life in the light of ancient myths - that's the main point of this discussion. Shambha's novel is based on an insignificant story and character of the Indian mythology, Kalkut has been able to reconstruct parts of the mythology from the very beginning. The central character of the novel is Shamb. The role of this character in the original Mahabharata of Indian mythology is very small. I think Kalkut wants to boost the morale of the despairing human society of the present time by introducing the fighting spirit of this little character in his novel. Kalkut even seeks to rationalize the credible possibilities that lie between the two lines of the epic. In his work, on the one hand, the character of Shambha has been newly created, on the other hand, the character has become an interesting and timeless character due to the inherent faith, fighting spirit and application of real intellect. By focusing on the character, the novelist wants to present timely thoughts, character's firmness, strength, concentration, introspection. Above all, how can a person who has disappeared (Shambha) achieve his goal in the end by pushing away various obstacles through intense mental endeavors - I will highlight my point through the discussion of Shambha character. I think that which can inspire the directionless, despairing person of the age.*

Keywords: struggle, Inspiration, victim of Imperceptible Politics, Psychological aspects, Reflects Today's era, Socio-Reality, Inner Strife.

লিখিত পুরাণ কাহিনি বা তারও পূর্বযুগের পুরাণের বীজস্বরূপ লোকশ্রুতিনির্ভর গল্প কাহিনিগুলিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মিথ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই আখ্যানগুলি 'আদিম পুরাণ-কথা'। কিংবদন্তীমূলক সেই কাহিনিগুলিতে অলৌকিকতার মধ্যেও বিদ্যমান আবহমানকালের মানবজীবনের

সত্যরূপ। তবে সাংকেতিকভাবে বিন্যস্ত এই অলৌকিকতার মর্মোদ্ধার করতে পারলেই ঐ শাশ্বত জীবনসত্যের রূপ বোঝা সম্ভব হয়। তাই কখনো কবি তথা শিল্পী লিখিত ঐ পুরাণ-কাহিনিকে নবযুগের পটে পুনলিখিত করে প্রকাশ করেন। তখন শিল্পসৌন্দর্য ও চিরন্তন মানবরসের সম্মিলনে যথার্থই পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটে। পুরাণরসের সঙ্গে যুগচৈতন্য ও শিল্পীর আত্মচেতনার রঙ মেলে সেই রচনায়। কিন্তু কোনো কোনো রচনায় শিল্পী পুরাণ-কাহিনির অন্তরালে আদিম-পুরাণের সত্য বা মিথ-কাহিনির আবিষ্কার করতে চান। নিজের রচনাকে সেই পুরাতন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে চান। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি আমাদের আলোচ্য কালকূটের ***শাম্ব*** উপন্যাসটি। এখানে মিথ-পুরাণের ব্যবহার কেবল আখ্যানধর্মী নয়, প্রতীকধর্মীও হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, শিল্পী জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখতে চান—বাস্তব জীবনে তিনি সর্বদা সেই কল্পনা-লীলার প্রতিরূপ দেখতে পান না। তাই বাস্তবকে মিথের কল্পজগতে সঞ্চারিত করে দেখতে চান বা ভাষান্তরে তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে মিথ-পুরাণের বাস্তবসত্যের পটে প্রতিফলিত করেন কিংবা কল্পনাগুলিকে এক নূতন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন। তার ফলে পুরাণের পুনর্জন্মের পাশাপাশি মহাকাল বা বিশ্বনিয়তির একটি ব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটও রচিত হয় আর শিল্পীর সৃজনলীলা নিছক ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন জীবনস্বপ্ন হয়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে একবার বলেছিলেন, 'ব্যক্তি অভিজ্ঞতা শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ না মিলতে পারছে ততক্ষণ তা সাহিত্যে মূল্যহীন'।১ আর এজন্য একমাত্র সহায়ক হচ্ছে মিথের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে, ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সমন্বয়। প্রাচীনকালেও প্রায় একই উদ্দেশ্যে মিথের ব্যবহার ছিল বলে মনে করেন বিষ্ণু দে। তাঁর মতে 'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজসত্তার অসঙ্গতি এড়াবার জন্যে সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো।'[২] একালের সাহিত্যে শুধুমাত্র সমাজসত্তার সঙ্গে অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের রূপক-চেতনার দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করতে চান একালের সাহিত্যিকেরা। সাম্প্রতিক জীবনাভিজ্ঞতা যখন একটি বিশ্বের অভিজ্ঞানের জন্ম দেয়, তখনই সৃষ্টিশীল রচয়িতারা ফিরতে চান মিথের কাছে। কারণ, মিথ মানবপ্রজাতির সত্তার অভিজ্ঞানের আধার। আধুনিক 'ফাঁপা' মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধে মিথ চেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত মানবমূল্যবোধ।

সমরেশ বসু ***কালকূট*** ছদ্মনামে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বেশকিছু ভ্রমণ-উপন্যাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল - 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'শাম্ব', 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে', 'শ্রীচৈতন্য'। আমাদের আলোচ্য কালকূট রচিত শাম্ব উপন্যাসটি। উপন্যাসটি ১৯৭৮ সালের দেশ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপরে দীর্ঘ দুই বছর পর ১৯৮০ সালে উপন্যাসটি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়। উপন্যাসে কালকূট মিথ কিভাবে কতটা গ্রহণ করেছেন এবং তার পুনর্নির্মাণ করেছেন, এমনকি প্রাচীন মিথের আলোকে সমকালীন জীবনভাবনার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটিয়েছেন --- তাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশ করবার পূর্বে মিথ বা পুরাণের চিরন্তনতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে --- 'পুরাণ কথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।'[৩]

শাম্ব উপন্যাসটি ভারতীয় পুরাণের একটি গুরুত্বহীন কাহিনী এবং চরিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র শাম্ব। ভারতীয় পুরাণের মূল মহাভারতে শাম্ব চরিত্রটির ভূমিকা নিতান্তই সামান্য।

মহাভারতের 'মৌষলপর্ব'-এ যদুবংশ ধ্বংসের জন্য যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেই মুষলের জন্ম বৃত্তান্ত সূত্রে শাম্বর কাহিনী এসেছিল। মহাভারতের 'মৌষলপর্ব'-এ ঋষিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হিসেবে শাম্ব প্রসঙ্গটি আমরা যেভাবে পাই তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ---

'জনমেজয় কলিলেন, ব্রাহ্মণ। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার সাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতরুপে কীর্ত্তন করেন।

বৈশম্পায়ন কলিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ঠ ও তপোবন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ। ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন?

সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দুর্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃদ্ধি ও অন্ধবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন।"

মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষুবংশীয়দিগকে কলিলেন যে, 'মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।'[৪]

যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হিসেবে মুষল ব্যবহৃত হলেও আসল কারণ তা ছিল না। যদুবংশ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল - অবাধ যৌনতা, ক্ষমতা প্রমত্ততা, ঈর্ষা-অসূয়া ইত্যাদি। তাই বৈশম্পায়ণ জানাচ্ছে --- 'মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভের পর ঘটূবিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইল, বৃষ্ণবংশ মধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থি হইয়াছিল। তাঁহার সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধন করে।'[৫]

বৃষ্ণিবংশ কুলপতি কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব। জাম্ববতী-র গর্ভে জন্ম তাঁর। 'সাম্বপুরাণম'-এ শাম্ব-র পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে --- '(শাম্ব) শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি বলরামের কাছ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে শৌর্যবীর্যে তারই অনুরূপ হন। ইনি দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মনার স্বয়ম্বরে তাঁকে বলপূর্বক অপহরণ করলে দুর্যোধনের আদেশে কৌরব বীরগণ কর্তৃক পরাস্ত ও অবরুদ্ধ হন। ইহাতে বলরাম হস্তিনাপুর এসে হল দ্বারা হস্তিনাপুরের উৎপাটনে উদ্যত হলে ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ লক্ষ্মণাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর সন্তোষজনক বিধান করে। ঋষিগণের সাপে ইনি প্রভাসযজ্ঞে কুশলনাশক মুঘল প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হলে দেবর্ষি নারদের উপদেশে সূর্যের উপাসনা করে আরোগ্য লাভ করেন।'৬ ভারতীয় পুরাণগুলিতে শাম্ব সম্পর্কে এই অংশগুলিই পাওয়া যায়। লক্ষনীয় কালকূট শাম্ব উপন্যাসটি রচনার সময় মহাভারতের শাম্ব সম্পর্কিত অংশটিকে তেমনভাবে অনুসরণ করেননি। বরং বলা যায় তিনি 'সাম্বপুরাণম'-এর অংশটিকে তার রচনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় কালকূট 'শাম্ব' বানান 'শ' দিয়ে লিখলেও সাম্বপুরাণম্-এ 'স' -ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা 'স' ও 'শ' অতীতে সংস্কৃতে অভিন্ন ছিল।

পুরাণের ***শাম্ব*** সম্পর্কে এই গুরুত্বহীন কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে কালকূট আমাদের নতুন কাহিনী শোনাতে চেয়েছেন। যেখানে তুলে ধরেছেন সময়পোযোগী ভাবনা, চরিত্রের দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, একাগ্রতা। সর্বোপরি বলা যায় সর্বস্বান্ত একজন ব্যক্তি (শাম্ব) কিভাবে ঐকান্তিক মানসিক প্রচেষ্টায় তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্দেশ্য সফল করেছে। শাম্ব চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সেই সংগ্রামের কাহিনী উপন্যাসটিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন কালকূট। এই শাম্বর জন্মকথা সম্পর্কে জানা যায় - একবার শ্রীকৃষ্ণের শিবের মত গুণসম্পন্ন একটি পুত্রলাভের ইচ্ছা হয়। তখন তিনি উপযুক্ত পরামর্শের জন্য এক ঋষির কাছে যান। তখন সেই ঋষি কৃষ্ণকে বলেন যে তিনি যদি এক হাজার ফুল নিবেদন করে বহু বছর ধরে শিবের আরাধনা করেন তাহলেই শিব তুষ্ট হয়ে তাঁর মত একটি পুত্র দান করবেন। সেই পরামর্শ অনুসারে কৃষ্ণ নির্জন পার্বত্য স্থানে নিভৃতে গিয়ে সারা অঙ্গে ভস্ম মেখে এবং বল্কল (গাছের ছাল) ধারণ করে শিবের আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। সেই উপাসনায় প্রসন্ন হয়ে দেবী পার্বতী এবং শিব উভয়েই কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে। তখন কৃষ্ণ তাঁদের কাছে শিবের সকল গুণসম্পন্ন একটি পুত্র প্রার্থনা করলে শিব তাঁকে সেই পুত্রলাভের বরদান করেন। এরপর কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এর কিছুকাল পরেই জাম্ববতীর গর্ভে শাম্বের জন্ম হয়।

শাম্ব উপন্যাসে কালকূট প্রথম থেকেই পুরাণের অংশগুলিকে পুনর্নির্মাণে মেতেছেন। দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নী জাম্ববতীর প্রথম সন্তান ছিল শাম্ব। শ্রীকৃষ্ণের জগতমোহিনী রূপকেও ম্লান করে দিত শাম্বর চোখ ঝলসানো রূপ। গুনেও সে ছিল মহাদেবের সমান। যদুবংশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম। তার ত্বক এত মসৃন ছিল যে তার সামনে ও আশেপাশে উপস্থিত যে কোনো বস্তুর ছবি প্রতিবিম্বিত হত তার শরীরে। অর্থাৎ আয়নার মত চকচকে ছিল তার চামড়ার মসৃনতা। তার আচার আচরণ ও ছিল বেশ নম্র ও ভদ্র। স্ত্রী, পুরুষ, ছোট বড় সকলকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বাক্য ব্যবহার করত সে। তার সম্পর্কে উপন্যাসিক আমাদের জানাচ্ছেন --- 'তাঁর অতি আয়ত চোখে সর্বদা কামনার বহ্নি অনল প্রজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটি চিত্তজয়ী দুর্বার আকর্ষণ আছে, রমণী মাত্রেই তাঁর দর্শনে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ হিসাবে তাঁর রূপ এমনই অসামান্য, তিনি নগরের পথে বের হলে, মাতা ও মাতৃপ্রতিম দুই চারি মহিলা ছাড়া সকল যাদব রমণীগণই, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন যে-কোনো অলিন্দে গবাক্ষে বা সোপানে তাঁকে একবারটি দেখবার জন্য ছুটে আসেন।.....তাঁর রতিকলাকুশলতা বিষয়ে রমণীগণ নানা কাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, অতি কামনায় অবশাঙ্গ ও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সকল রমণীগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত আছেন। যথাস্থানে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন।'[৭] এমন রাজপুত্রকে মহর্ষি নারদের চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার রাজভবনে এসে উপস্থিত হলেন। তার আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্র শ্রীকৃষ্ণ সহ তার পরিবারের সকল সদস্যরা ছুটে এসে দেবর্ষিকে আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু শাম্ব এলো না। শাম্ব তখন পার্শ্ববর্তী একটি কাননে কয়েকজন রমণীর সঙ্গে প্রেমালাপেরত থাকায় নারদের প্রতি অবহেলা করলেন। দেবর্ষিকে দেখেও চোখ সরিয়ে নিলেন সে। লেখক আমাদের জানাচ্ছেন - 'শাম্ব আচরণবিধি জানেন না, এমন না। তবু ভুলে গেলেন। প্রেম প্রণয়লীলা এমন ভুলের সৃষ্টিও করে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আর মানুষে মাত্রকেই তার মূল্য দিতে হয়।'[৮] এখান থেকেই কালকূট পৌরাণিক শাম্বকে যেন আর দেবপুত্র করে রাখেন নি মর্ত্যের ধূলিধূসরিত একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাই শাম্বর এই আচরণে অপমানিত বোধ করে নারদ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করলেন। 'শাম্ব

সকলের প্রিয়, কিন্তু সে প্রিয়তম পুরুষ আপনার ষোল হাজার রমণীর! যে-ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করে, আপনি ভর্তাস্বরূপ তাদের গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রতি প্রেমবশতঃ স্যমন্তক মণি আপনি ধারণ করতে পারেন নি, সেই ষোল হাজার রমণী শাম্ব সঙ্গলাভে ব্যাকুল। শাম্বই তাদের ধ্যানজ্ঞান। এ কি পাপ নয় ?'[৯] এভাবেই দ্বারকাত্যাগের আগে দেবর্ষি নারদ একবার কৃষ্ণের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করলেন যে নরকাসুরের কারাগার থেকে উদ্ধার হওয়া কৃষ্ণের ষোল হাজার রমণী শাম্বের প্রতি আসক্ত। এত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয় একজন সাধারণ মানুষের আর একজন সাধারন মানুষকে ঈর্ষাবশত পরিকল্পনা করে ফাঁদে ফেলা। এই অংশে দেবর্ষি নারদকে রগচটা গোয়ার ধরনের ব্যক্তি বলে মনে হলেও মহর্ষি নারদ আদৌ তা নন (স্বতন্ত্র ভাবে তার চরিত্র ব্যাখ্যায় অনুভব করা যায়)। পুরান থেকে বেরিয়ে এলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মহর্ষি নারদের এই অভিযোগের কি কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল? তার উত্তর দিতে গিয়ে উপন্যাসে কালকূট বলেছেন - 'মহর্ষি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞাত ছিলেন। অথবা কেবলমাত্র রমণীর মন বিষয়ে, নানা দেশের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত দান করেছিল, কৃষ্ণকে সেই গুরুতর অভিযোগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানব সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণের আচরণের নানা রীতি ও বৈপরীত্য বিষয়ে অবগত আছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'[১০] এই অংশে চরিত্রের বাস্তব সম্মত মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় তাদের আর পৌরাণিক চরিত্র বলে মনে হয় না। তারা যেন আমাদের মতই জীবন অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ঈর্ষা দ্বারা জর্জরিত এক সাধারন চরিত্র। কিন্তু কৃষ্ণ নারদের এই অভিযোগ অবিশ্বাস করে বললেন যে, তাঁর প্রতি ষোল হাজার স্ত্রী সহচরী রমণীদের একনিষ্ঠ প্রণয় বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই এবং শাম্বের বিশ্বস্ততা ও পিতৃভক্তিও প্রশ্নাতীত। এই কথা শুনে এবং শাম্বকে দণ্ড দিতে না পেরে দেবর্ষি নারদ আরও ক্রুদ্ধ হলেন। সেইসময় তিনি দ্বারকা ত্যাগ করে কিছুকাল পরে আবার দ্বারকায় ফিরে এলেন। তখন এসে প্রথমেই তিনি রৈবতক পর্বতের গভীরে কৃষ্ণের প্রমোদকাননে গেলেন। সেখানে গিয়ে দূর থেকে নারদ দেখলেন যে কৃষ্ণ, তাঁর মহিষীগণ ও ষোল হাজার রমণীদের সঙ্গে সুখে জলকেলিতে মগ্ন। কৃষ্ণকে ঘিরে বিভিন্ন রমণী নানা ক্রীড়াকৌতুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ সুরাপান করে প্রমত্তা হয়ে প্রণয়বাক্য উচ্চারণ করছে ও অন্যান্য রমণীদেরও সুরাপাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণও অতি উদার ও প্রমত্তাবস্থায় তাঁর প্রিয় রমণীদের ইচ্ছাপুরণ করে তাদের আহ্লাদিত করছেন। নারদ লক্ষ্য করলেন যে সুরাপানে আসক্ত রমণীদের বসনভূষণের শৈথিল্য ও নগ্নতার বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই কারণ রৈবতকে অবস্থিত সেই প্রমোদ উদ্যান ও সরোবরে একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের উপস্থিতির কোন উপায় নেই। দ্বারকায় এইকথা সর্বজনবিদিত যে কৃষ্ণের প্রমোদকানন ও জলকেলি স্থান একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর সকল পুরুষের অগম্য। কেবলমাত্র কোন বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে কাউকে ডেকে আনতে পারেন। রমণীদের সাথে কেলিতে মত্ত কৃষ্ণকে দেখে নারদ ছলনাপূর্বক শাম্বকে গিয়ে সংবাদ দিলেন কৃষ্ণ তাঁর প্রমোদ উদ্যানে শাম্বকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই অংশে স্পষ্ট এ যেন কোন পুরাণের কাহিনী নয় সাধারণ দুই চরিত্রের স্বাভাবিক ঈর্ষা। অন্য সকলের মত শাম্বও জানতেন যে সেই প্রমোদকাননে কৃষ্ণ ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু নারদের ছলনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি ভাবলেন যে সত্যিই কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই তিনি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলেন। রমণীদের সাথে জলক্রীড়ারত কৃষ্ণ শাম্বকে সেই কেলিস্থলে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁর ষোল হাজার রমণীকুল শাম্বকে দেখে সহসা উল্লসিত হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্য তারা শাম্বের প্রতি আসক্তি বোধ করল। 'তাদের সকলের আরক্ত সিক্ত চোখ মুখ কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো।

কামোচ্ছাসে তারা সকলে নির্বাক হয়ে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণের উপস্থিতি সত্ত্বেও শাম্বের রূপ নিয়ে তারা প্রগলভ গঞ্জনে মেতে উঠলো।....রমণীগণ শাম্বকে তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো। তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বিবিধ ভঙ্গিসহকারে শাম্বর সামনে এমনভাবে উচ্ছিত হলো যে, সকলের কামোচ্ছাস অত্যন্ত প্রকটিত হলো। অতিমাত্রায় সুরাসবপানে, মত্ততাপ্রসূত, তারা শাম্বর প্রতি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাদের উজ্জ্বল রূপলাবণ্যরাশি অনাবৃত করলো।'১১ যে রমণীদের জীবনে একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ ছাড়া আর কারও স্থান নেই সেই রমণীরা স্বয়ং বাসুদেবের সামনেই অপর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্পর্ধা দেখানোয় তাঁর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হল। লক্ষনীয় নারীদের যৌনপ্রবৃত্তির চাহিদা। তারা বিস্মিত হয়েছেন তারা জগদীশ্বর ভগবান কৃষ্ণের সহচরী। তাই কৃষ্ণের উপস্থিতিতেই অসীম রূপ-লাবণ্যময় যৌবনের অধিকারী শাম্বকে দেখে তারা নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে অবদমন করতে পারেনি। তারা প্রত্যেকেই তাদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ কৃষ্ণের উপস্থিতিতেই শাম্বকে আকর্ষিত করতে যৌবনকে হাতিয়ার করলেন। তাই দেখে মুহূর্তেই কৃষ্ণ ক্রোধে ও গ্লানিতে তাঁর রমণীদের প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ও তাদের শাপ দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তারা তস্কর দ্বারা লাঞ্ছিত হবে। অংশগুলির তারা কৃষ্ণের দেবত্ব তেমন ভাবে প্রমাণিত হয় না যতটা সাধারন মানুষ বলে থাকে বিবেচিত হয়। জগদীশ্বর হয়েও একজন সাধারন মানুষের মতোই ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে তারই কাঙ্খিত নারীদের তিনি অভিশাপ দিলেন। এরপর তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শাম্বকেও অভিসম্পাত করলেন - 'তোমার এই রমনীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'১২ তখন বিস্মিত ও আতঙ্কিত শাম্ব কৃষ্ণকে অনুনয় করে বোঝালেন যে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর প্রমোদকাননে আসেননি। এভাবেই দেবর্ষি নারদের চক্রান্তের শিকার হয়ে শাম্ব দোষ না করেও শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হল। লঘু পাপে গুরু দন্ড দেওয়া হল তাকে। এখানে শাম্বকে পিতৃভক্ত সন্তান রূপেই আমরা পাই। শাম্বর জন্মকুন্ডলিতে ছিল, শাম্বর দুরারোগ্য ব্যাধি হবে - এ কথা শ্রীকৃষ্ণ জানত। কিন্তু তারই মুখ দিয়ে অভিশাপ হয়ে তা বেরিয়ে আসবে, সে কথা ভাবেনি সেও। এরপর শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে দেবর্ষি নারদ এই কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় বলে দিল।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে দেবর্ষি নারদ রোগ মুক্তির উপায় বলে দিল - 'ইনি (সূর্য) একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণেরও ঊর্ধ্বে। ইনিই সকল শক্তির উৎস। ইনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। তোমার একমাত্র পুজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন, সেই জন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।'১৩ – সূর্যালোকে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মিত্রবনে গ্রহরাজ (শনিদেব নয়, সূর্য দেব) সকল দেবতাদের নিয়ে মধ্যমণি হয়ে আছেন। সেখানে গিয়ে এই একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে মুক্তি মিলবে। শাম্বর এই যাত্রা সমগ্র উপন্যাস ধরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে। পথ পেলেন, সমুদ্র তীর থেকে উত্তর দিকে গিয়ে আবার উত্তর-পূর্বে যেতে হবে। এরপর রোগাক্রান্ত কুৎসিত চেহারা আর অশক্ত শরীর নিয়ে প্রায় একবছরের বেশি সময় ধরে পায়ে হেঁটে সাতটি ঋতু অতিক্রম করে এক আসন্ন সন্ধ্যায় তিনি চন্দ্রভাগা তীরে পৌছলেন। সেই নদী দর্শন করা মাত্র শাম্বর অন্তরে আনন্দ জেগে উঠলো এবং সে স্বগোক্তির সুরে বলল - 'সিন্ধু নদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?' এরপর আরো অতি দূর্গম রাস্তা পেরিয়ে সকলের ঘৃণা, দয়া সহ্য করে শাম্ব পৌঁছল মিত্র বনে। কিন্তু হায়! তাকে এখানেও নিরাশ হতে হলো। কেননা সূর্যালোক খুঁজে পাবার আগেই দেখল ওর মত আরো সত্তর জন রোগগ্রস্ত নারী, পুরুষ। যাদের দুই-একজনের কোলে শিশু! আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগগ্রস্থ না। কিন্তু এরা কেউই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয় নি। এখানে এলেই রোগমুক্ত হওয়া যায় না,

রোগমুক্তির উপায় জানা যায় মাত্র। সে চন্দ্রভাগার তীরে ঋষির নিকট জানতে পারল - 'এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে লবণদধি তীরে উদয়াচলে তিনি প্রথম আবির্ভূত হন। সেখানে তিনি পুর্বোত্তর কোণে উদিত হন, সেজন্য তাঁকে সেখানে কোণাদিত্য বলা হয়। এই আদ্যস্থানে তিনি পশ্চিম দক্ষিণে অস্তাচলে যান। যমুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মধ্যাহ্নে অবস্থান করেন। তখন তিনি কালপ্রিয় নামে অভিহিত হন। মহাব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য, এই তিন স্থানে, তিন কালে তাঁর প্রভা অঙ্গে ধারণ করা বিধেয়। .... যে-দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই সকল নাম বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভান, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম এবং দ্বাদশ রূপে তিনি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীতে, অতি ক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ দিন সেই সব নদ নদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।"১৪ এখানেই শেষ নয় ঋষি আরও জানিয়েছেন দ্বাদশ স্থান পরিভ্রমণ করে আসার পর তিনি শাম্বকে এ সম্পর্কে আরো নতুন বৃত্তান্ত বলবেন। অর্থাৎ মুক্তি নয়, মুক্তির উপায় জানতে পারল মাত্র। শাম্ব মনে করলি একা যেতে পারত। কিন্তু ওই সত্তর জনকেও রোগমুক্ত করতে চায় শাম্ব। কিন্তু তারা চায় না। কেননা তারা বিশ্বাস হারিয়েছে। তাদের কথায় - 'কিসের বিশ্বাস? আমাদের আবার কিসের বিশ্বাস থাকতে পারে?... আমাদের সবই হারিয়ে গেছে। আমাদের আর কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই।' এরপর শাম্ব বলে উঠলো - 'আরোগ্যলাভের বিশ্বাস', 'যার বিশ্বাস হারায়, তার সবই হারিয়ে যায়', 'আমি বিশ্বাস করি, আমার পাপই আমাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, আর একমাত্র মুক্তির উপায়, দুষ্কর প্রায়শ্চিত্ত। এই আমার বিশ্বাস'। এভাবেই শাম্ব সবাইকে নানা রকম কথা বলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে তাদের সঙ্গে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং নিলও। এখানেই প্রমাণ হল শাম্বর স্বতন্ত্রতা - একা নয় সকলকে নিয়ে এগোতে চায় সে। সকলের রোগমুক্তি তার কাম্য। আবারও এক বছরের বেশি সময় ধরে বারোটা ঋতুতে বারোটা নদীতে শুক্ল সপ্তমী তিথিতে স্নান করে মিত্রবনে ফিরল নদীর জলে পাওয়া কল্পতরু কাঠের একটি সূর্যদেবের মূর্তি কাঁধে করে, সঙ্গে সত্তর জনের মধ্যে টিকে যাওয়া মাত্র চোদ্দ জন সহযাত্রী। দুর্গম পথ অতিক্রম করে রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এলো তারা। তাদের সকলের মধ্যেই এক আশ্চর্য রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। 'সকলের মধ্যেই নবজীবন লাভের একটি উদ্দীপনা জেগেছে। অথচ সেই উদ্দীপনার মধ্যে কোনরকম উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাস নেই। আছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, সকলের আচরণে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। শাম্বও অন্তরে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। এই নবজন্মের সুচনায়, যেন একটি নতুন সংঘের স্থাপনা ঘটেছে।' এরপরও থামেনি শাম্ব। শরীর থেকে চিরদিনের মতো এই ব্যাধি দূর করতে সূর্য দেবের পূজারী খুঁজতে গেল সে। কেননা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ঋষির কাছে তিনি জেনেছেন - 'শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা কেবল সূর্যোপাসক নন, এই ব্যাধিকে দেহ থেকে আমুল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল, তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানেন, গ্রহরাজই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন।'১৫ আবার একবছরের বেশি সময় ধরে পায়ে হেঁটে বরফের দেশ পেরিয়ে ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে অতি দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে সেই শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণ পূজারীদের নিয়ে এলেন। তাদের সপরিবার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করলেন। তারাই এই রোগকে চিরকালের মতো শরীর নির্মূল করতে পারে। তাদের ওষুধে শাম্ব সহ অন্য চোদ্দ জনের রোগ শরীর থেকে নির্মূল হল। তার মসৃন ত্বকে দ্বারকার রাজপ্রাসাদের জৌলুস নয় এবার মিত্রবনের নদী, বন, গাছপালা সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিবিম্বিত হল। তবু শাম্ব থামল না। তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বহুঅর্থ ব্যায় করে, বহুবছর ধরে, বহুশ্রম করে মোট তিনটি মন্দির স্থাপন করল (নদীর উৎস, মোহনা

ও মিত্রবনে)। প্রত্যেক মন্দিরে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা পূজারীদের সপরিবার থাকার ব্যবস্থা করল। তারা সূর্য-পুজোর সঙ্গে সঙ্গে এই দুরারোগ্যের চিকিৎসা করতে লাগল। এরপরও শাম্ব দ্বারকায় গেল না। তার সুন্দরী স্ত্রী লক্ষ্মনাকে জানিয়ে এসেছে যে সে কোনো দিন আসবে না। কিন্তু লক্ষণা চাইলে মিত্রবনে আসতে পারে। তাই সে বলে এসেছে - 'তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে-কোনো সময় পঞ্চনদীর দেশে, চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে এসো। সেখানেই তোমার যদি বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাস করো। আরও শোন লক্ষণা, জীবন কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চরমান, পরিবর্তনশীল। তুমি তপোবনে গেলে, রৈবতকের এই হর্ম্যতলের বিলাসকক্ষের জীবন পাবে না। তোমার স্বামীকেও পূর্বের ন্যায় পাবে না। তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।'১৬ রাজ প্রাসাদের সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ কোনো কিছুই তার কাছে আর কাঙ্খিত নয়। তাই শাম্ব সমাজ সেবায় নিয়োজিত হল। বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করল শাম্ব। দূর-দূরান্ত থেকে রোগগ্রস্ত মানুষ ছুটে আসতে লাগল আরোগ্যের আশায় এই মন্দিরগুলোতে। তাদের চিকিৎসা শুরু হল শাম্বর তত্ত্বাবধানে। তিনটি মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগল শাম্ব। যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা দায়িত্ব পালন করছে কি না তা নিজে গিয়ে দেখতে শুরু করল। 'মিত্রবনের ঋষির নির্দেশ মতো শাম্ব প্রতি চার মাসে তিনস্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয়-কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমদ্রতীরে কোণবল্লভ ক্ষেত্র। এই সময় তাঁর সঙ্গে আদি চৌদ্দজন তিন স্থানেই গমনাগমন করলো।' এই হল তার জীবনের মূলব্রত। সবাই দুহাত তুলে ধন্য ধন্য করল। শাম্বর নামে নগরের নামকরণ হল ***শাম্বপুর,*** তার অজান্তেই। দ্বারকার রাজকুমার শাম্ব নিজের কঠোর পরিশ্রমে আর মনের জোরে হয়ে উঠল সে যুগের জন প্রতিনিধি। দেবর্ষি নারদ ও মুগ্ধ হয়ে মিত্রবনের শাম্ব প্রতিষ্ঠিত কল্পতরু কাঠের বিগ্রহের (যেটা কাঁধে করে বয়ে এনেছিল) নাম দিল ***শাম্বাদিত্য***। 'হৈ সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।' শাম্বর সারা শরীর শিহরিত হলো। শাম্বাদিত্য! এ কী নামে মহর্ষি গ্রহ-রাজকে সম্বোধন করলেন? মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক নাম শাম্বাদিত্য। এই নামেই তিনি এখানে পূজিত হবেন।' এইভাবেই শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে জয় লাভ করে শাম্ব হয়ে উঠল কালজয়ী যুগপুরুষ। এভাবেই শাম্ব চরিত্রের প্রত্যেকটি ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক সংগ্রামী মনোভাবের দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন কালকূট। এর সঙ্গে উপন্যাসিক তার অর্জিত জীবন উপলব্ধিকে নিজস্ব বিশ্লেষণাত্মক শৈলীতে পাঠকের সম্মুখে পরিবেশন করেছেন। যা আমাদেরকে পৌরাণিক চরিত্রের(শাম্ব) জীবন দর্শনের অতল অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে আধুনিক ভাবনায় ভাবিত হতে সাহায্য করে।

শাম্ব উপন্যাসে পুরানে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনার বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন কালকূট। তাই শাম্ব উপন্যাসের ভূমিকায় কালকূট প্রথমেই আমাদের জানিয়ে রেখেছেন --- 'শাম্ব-কাহিনী—বিশেষতঃ তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ, এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্বকেও আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, "বিশ্বাসী" উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে দেখেছি।'১৭ তার এই বক্তব্য অংশ থেকে স্পষ্ট, তিনি অতিপরিচিত চরিত্র ও ঘটনাবলীকে, এমনকি চোখের আড়ালে থেকে যাওয়া চরিত্রটির অজানা সব গুণাবলিকে এক এক করে তুলে

ধরে যে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বিশ্বাসী হৃদয় নিয়ে চরিত্রটির নবনির্মাণ ঘটালেন, তা পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যে শাম্ব সম্পর্কে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি মহাকাব্যে আদতে এভাবেই ছিল কিনা। পুরাণের এই(আপাতভাবে বলা যায়) নিষ্ক্রিয় চরিত্র শাম্বকে লেখক কালকূট যেন তাঁর উপন্যাসে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহাকাব্যে তিনি সামান্য কয়েকটি পঙক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার বিস্তৃত জীবন পরিক্রমার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

বহু বিচিত্র কাহিনীর আখ্যান হল মহাকাব্য মহাভারত। আর সেই প্রাচীন মহাকাব্য হল চরিত্রদের রঙ্গশালা, যেখানে একের পর এক শক্তিশালী চরিত্রেরা ভিড় করে রয়েছে। আবার প্রধান চরিত্রগুলির ভিত হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন কিছু চরিত্র যারা প্রথম সারিতে না এলেও মহাকাব্যের অনেক বড় বড় দায়িত্ব সামলেছেন। এদের সংখ্যাটাই তুলনামূলক বেশি। সেরকম চরিত্রদের মধ্যে অন্যতম শাম্ব, যাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত পুরাণের নবনির্মাণে মেতেছেন কালকূট। চরিত্রের মহারণ্য থেকে তাকে এবং তার ঘটনাকে নির্বাচন করে আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থাপিত করলেন তিনি। এছাড়াও তিনি চরিত্রটির সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বর্তমান সময়ের নিরাশাগ্রস্থ মানবসমাজের মনোবল বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চেয়েছেন। এমনকি মহাকাব্যের দু'লাইনের মাঝে চাপা পড়ে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে চেয়েছেন কালকূট। তাঁর এই কাজে একদিকে শাম্ব চরিত্রটি যেমন নবনির্মিতি লাভ করেছে, তেমনি চরিত্রের অন্তর্গত বিশ্বাস, সংগ্রামী মনোভাব এবং বাস্তব যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় এবং কালজয়ী একটি চরিত্র।

তথ্যসূত্র:

১) দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ , '*স্বগত*' (কাব্যের মুক্তি প্রবন্ধ), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা : ৭৩, দে'জ পুনর্মুদ্রণ : ১৪১৭ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা : ২১।

২) দে, বিষ্ণু *'প্রবন্ধসংগ্রহ'* (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা : ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১৮, পৃষ্ঠা : ৩৩।

৩) মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদিত), '*বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে*' , পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা : ০৯, পৃষ্ঠা : ৬৭।

৪) সিংহ, কালীপ্রসন্ন অনূদিত, '*মহাভারত*', প্রকাশনা ও প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি(ইন্টারনেট মাধ্যমে পিডিএফ সংগৃহীত)। পৃষ্ঠা : ১১৫৫।

৫) প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়, (মৌসল পর্ব্ব), পৃষ্ঠা : ১১৬৭।

৬) গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ, অনূদিত, '*শ্রীসাম্বপুরাণম*', ভারত-মহিলা মেসিন প্রেস— উয়ারী, ঢাকা, (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত), প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩১৭ সন, পৃষ্ঠা : ১৭৮।

৭) কালকূট, '*শাম্ব*', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা : ০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯২, পৃষ্ঠা : ৩৩।

৮) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪।

৯) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫।

১০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৮।

১১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৯।

১২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪০।
১৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৮।
১৪) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭০-৭১।
১৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮০।
১৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮২।
১৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ভূমিকা অংশ।

সহায়ক গ্রন্থ

১) সুধীরচন্দ্র সরকার , 'পৌরাণিক অভিধান', এম.সি.সরকার প্রাই: লিমি:, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৩৬৫.
২) চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা : ০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১৫।